Scanned BY:
Rony
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

প্রেত

www.banglabook.com

Thanks to Shohel Kazi & Banglabook:
Rony
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

প্রেত

পিশাচ সাধনার এক ভয়ঙ্কর কাহিনী

মুহম্মদ জাফর ইকবাল

জ্ঞানকোষ প্রকাশনী

www.banglabook.com

স্বত্ব
লেখক

প্রকাশক
শরীফ হাসান তরফদার
জ্ঞানকোষ প্রকাশনী
৩৮/২-ক বাংলাবাজার

প্রকাশকাল
তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৪
চতুর্থ প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৯৬
পঞ্চম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
ষষ্ঠ প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০২
সপ্তম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০০৬

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
ধ্রুব এষ

কম্পোজ
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ
ঢাকা

Rony
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

এই বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।
জীবিত বা মৃত ব্যক্তি বা বাস্তব ঘটনার সাথে
এর কোনও সম্পর্ক নেই।

॥ লেখক ॥

www.banglabook.com

লেখকের অন্যান্য বই

কপোট্রনিক সুখ দুঃখ
মহাকাশে মহাত্রাস
দেখা আলো না দেখা রূপ
হাত কাটা রবিন
ট্রাইটন একটি গ্রহের নাম
দীপু নাম্বার টু
দুষ্টু ছেলের দল
ক্রুগো
একজন দুর্বল মানুষ
আকাশ বাড়িয়ে দাও
বিজ্ঞানী সফদর আলীর মহা মহা আবিষ্কার
স্বাধীনতা : বিশ বছর পর (সম্পাদিত)

www.banglabook.com

প্রথম অংশ
অন্ধকার জগৎ

এক

রুমী বরাবরই একেবারে সাধারণ ছেলে। সাধারণ ছেলেদের মতো তাকে কেমন দেখাচ্ছে সে নিয়ে তার মাথাব্যথার শেষ ছিল না। ক্লাসের ফিটফাট ছেলেদের দেখে তাই তার ভিতরে হীনমন্যতা জেগে উঠতো। ঘুরেফিরে দুটি প্যান্ট পরেই তাকে ক্লাসে আসতে হয়, ব্যাপারটা অন্যেরা লক্ষ্য করছে কিনা সে নিয়ে তার দুশ্চিন্তার সীমা নেই। টিউশানির টাকা পেয়ে সে যখন হাল ফ্যাশানের চওড়া কলারওয়ালা নূতন একটা শার্ট তৈরি করলো তার ভিতরে তখন আনন্দের একটা জোয়ার বয়ে গিয়েছিল। সে সেই শার্ট পরে দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটার সময় সাবধানে দোকানের আয়নায় নিজেকে লক্ষ্য করতো। তার চেহারা মোটামুটি ভালো এ নিয়ে সে খুব সচেতন, গায়ের রঙটা আরেকটু ফর্সা হলে তার আর কোনো দুঃখ থাকতো না। অন্যদের দেখাদেখি সে তার চুলকে কান ঢেকে ঝুলে পড়তে দিয়েছে, তাই সেগুলিকে আগের থেকে বেশি যত্ন করতে হয়। কাছে পিঠে কেউ না থাকলে আজকাল সে তার পকেট থেকে ছোট একটা চিরুনি বের করে অনেক যত্ন করে চুল ঠিক করে নেয়। তার বয়সী অন্য যে-কোনো ছেলেদের মতো রুমীরও মেয়েদের নিয়ে খুব আগ্রহ। রাস্তাঘাটে কোথাও কোনো মেয়ে তাকে আলাদা করে লক্ষ্য করে কিনা সেটা জানার তার খুব কৌতূহল। কখনো কোনো কারণে কোনো মেয়ে ঘুরে দ্বিতীয়বার তার দিকে তাকালে সে সারাদিন ঘটনাটি ভুলতে পারে না। এমনিতে সে খুব মুখচোরা, কোনদিন যেচে কোনো মেয়ের সাথে কথা বলবে এরকম সাহস নেই ; অথচ প্রায়ই সে কল্পনা করে একটা আধুনিকা মেয়ে তার জন্যে পাগল হয়ে আছে। প্রতিবার নূতন টিউশানি নেবার আগে সে মনে মনে আশা করে একটি সুন্দরী মেয়েকে পড়াবে, কিন্তু কখনোই তা হয়ে ওঠেনি। কে জানে, সুন্দরী মেয়েদের বাবারা হয়তো উঠতি বয়সের কলেজের একটা ছেলের হাতে মেয়েকে অংক কষতে দেয়ার সাহস পান না!

রুমীর সবচেয়ে বড় সমস্যা তার নিজেকে নিয়ে। সে প্রাণপণ চেষ্টা করে কেউ যেন বুঝতে না পারে সে মফঃস্বলের ছেলে। ক্লাসের ফিটফাট ইংরেজী কথা বলা ছেলেদের সে মুগ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করে। শুদ্ধ ইংরেজীতে সে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে যেতে পারে, কিন্তু মুখে মুখে সে ইংরেজীতে একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। চেষ্টা করে দেখেছে, তার গ্রাম্য ক্লাস-টীচারের সুর এসে পড়ে। বৃদ্ধ ক্লাস-টীচারের তাকে নিয়ে যত গর্বই থাকুক না কেন, রুমীর নিজেকে নিয়ে লজ্জার সীমা নেই। এক সময় ফিটফাট ছেলেদের সাথে সে মেশার চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু তাদের প্রচ্ছন্ন অবহেলা বুঝতে পেরে সে নিজের মাঝে গুটিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে রুমী কল্পনা করে সে বিদেশ থেকে অনেক বিখ্যাত হয়ে ফিরে এসেছে, আর এই সব ফিটফাট ছেলেরা তার সাথে দেখা করতে এসেছে। সে যেন বিশুদ্ধ সাহেবী ইংরেজীতে বলছেঃ তোমাদের দেখেছি দেখেছি মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক চিনতে পারলাম না তো!

রুমীর এই ধরনের অনেক কল্পনা, সাধারণ ছেলেদের মতো তার কল্পনাগুলিও সাধারণ। মোহ আর উচ্চাশা তাকে বাঁচিয়ে রাখে। যা কিছু বিদেশী তাতেই আজকাল তার প্রচণ্ড বিশ্বাস। নিজের দেশের রাজনীতি পর্যন্ত সে বিদেশী সাংবাদিকদের আলোচনা পড়ে শিখতে চেষ্টা করে। দেশকে নিয়ে সে আজকাল সত্যি সত্যি হতাশাগ্রস্ত, বিদেশীরা কিভাবে উন্নতি করে ফেলছে আর এদেশের লোকেরা কিভাবে নিজেদের সর্বনাশ করছে এ ব্যাপারে আজকাল সে বুদ্ধিজীবীদের সাথে একমত। একবার দেশের বাইরে যেতে পারলে সে আর কোনদিন ফিরে আসবে না এরকম একটা ধারণা আস্তে আস্তে তার ভিতরে গড়ে উঠছে। সার্থক জীবনের অর্থ বিদেশে প্রতিষ্ঠা, এ ব্যাপারে তার আজকাল আর কোনো সন্দেহ নেই। এই আশা নিয়েই সে আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠছিল, কিন্তু একদিন সেটাতে একটা চোট খেয়ে গেল।

তখন পরীক্ষার মাসদুয়েক বাকি, পড়াশোনার খুব চাপ। বিকেলে একটা টিউশানি করে রুমী খুব ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ছাত্রটার আলাদা পড়ার ঘর নেই, কাজেই মধ্যবিত্তের সংসারের ঠিক মাঝখানে বসে থেকে তাকে পড়াতে হয়। দৈনন্দিন তিক্ত ঘটনাবলীর মাঝে বসে থেকে প্রায়-নির্বোধ একটি ছেলেকে এক জিনিস দশবার করে বোঝাতে তার দুই ঘণ্টা সময়কে দশ ঘণ্টার মতো দীর্ঘ মনে হয়। তার উপর কোনদিনই তাকে কিছু খেতে দেয় না, প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে সে উঠে আসে।

চা খেয়ে খিদে নষ্ট করার জন্যে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার কাছাকাছি একটা চায়ের দোকানে যেতো। আজকাল সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা এসে আড্ডা জমায়। তাদের দেখা একটা মজার কাজ। একজন দুজন রুমীর মনের মতো বের হয়ে পড়ে, তাদের সে মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে লক্ষ্য করে সময় কাটিয়ে দেয়। নিজের অগোচরে সে তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করে কথাবার্তায়, হাসিতে, পোশাকে, হাঁটার ভঙ্গিতে।

সেদিন বৃষ্টি বলে চায়ের দোকানে ভিড় কম। রুমী জানালার পাশে একটা চা একটা সিংগারা নিয়ে আরাম করে বসেছে। তার ঠিক পাশেই একজন গভীর মনোযোগ দিয়ে গাঁজা ভরা একটা সিগারেট নির্বিকার ভাবে টেনে যাচ্ছে। সামনের টেবিলে বসে দুজন তর্ক করছে—বিষয়বস্তু রুমীর জ্ঞানের বাইরে, কোনো একজন আমেরিকান অর্থনীতিবিদের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের যৌক্তিকতা। তর্ক উত্তপ্ত হতেই কথাবার্তায় ইংরেজী বের হয়ে আসতে থাকে। কি সুন্দর উচ্চারণ, কি সুন্দর কথা বলার ভঙ্গি, কি চমৎকার শব্দ চয়ন! রুমী মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকে।

দাদা কি করে আপনাদের?

রুমী গলার স্বর শুনে চমকে তাকায়। গাঁজা খাওয়া লোকটি লাল চোখে কিন্তু মুখে একটা হাসি নিয়ে তর্করত ছেলে দুটিকে জিজ্ঞেস করছে। ছেলে দুটি থতমত খেয়ে থেমে গিয়ে একজন আরেকজনের মুখের দিকে তাকালো। প্রশ্নটি ঠিক বুঝতে পারেনি ভেবে লোকটি গলা উঁচিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, আপনাদের দাদারা কি করতেন?

এক্সকিউজ মি?

আপনার দাদা, মানে আপনার বাবার বাবা কি করতেন?

কেন?

গরীব ছিলেন কিনা? চাষা, কি গোয়ালা, কি মাঝি?

হোয়াট? একজনের ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে ওঠে, হোয়াট ডু ইউ মীন?

আহা-হা-হা রাগ করেন কেন? আমি শুধু জানতে চাইছি আপনাদের দাদারা কি করতেন?

কেন? ইটস নান অফ ইওর বিজনেস। আমার দাদা যা খুশি করুক তাতে আপনার কি?

লোকটার মুখে তখনো হাসি। পান খাওয়া দাঁত বের করে বললো, বলতে না চাইলে বলবেন না। লজ্জা করলে বলবেন কেন?

একটা বড় ঝগড়া লেগে যাবার উপক্রম, অন্য ছেলেটা কোনমতে থামিয়ে দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে বের হয়ে গেল। গাঁজা খাওয়া লোকের সাথে ঝগড়া করে কখনো, কি বলতে গিয়ে কি বলেছে!

রুমী আড়চোখে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করে, এমন অভদ্র লোকও আছে! লোকটা তখনো খিক খিক করে হাসছে যেন একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে। রুমীর চোখে চোখ পড়তেই বললো, দশ টাকা বাজি।

রুমী থতমত খেয়ে বললো, বাজি?

হ্যাঁ। ঐ দুইটার ভিতরে অন্তত একটার দাদা গয়লা না হয় ধোপা ছিল!

কেন? রুমী একটু উত্তপ্ত হয়ে যোগ না করে পারলো না, ধোপা কিংবা গয়লা হওয়া দোষ নাকি?

দোষ কেন হবে? লোকটা সাগ্রহে মাথা এগিয়ে আনে, দাদা ধোপা ছিল তাই বাপ খুব কষ্ট করে বড় হয়েছে। এখন ছেলেদের তাই সাহেব বানাচ্ছে। ভুলতে পারে না তো নিজে ধোপার পোলা! এমন সাহেবের সাহেব যে বাড়িতেও ইংরেজী ছাড়া কথা বলে না।

রুমী যুক্তিটার মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝে চুপ করে রইলো। লোকটার তাতে নিরুৎসাহিত হবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, নিজের মনে সে মা-বাপ তুলে গালিগালাজ দেয়া শুরু করে।

অস্বস্তিতে নড়েচড়ে বসে রুমী তাড়াতাড়ি নিজের চা শেষ করার চেষ্টা করতে থাকে। উঠে পড়া ভালো, কে জানে আবার কখন তাকে ধরে বসবে।

ইংরেজী! ইংরেজী বলেন! লোকটা আবার শুরু করে, জার্মান বলে না কেন? স্প্যানিশ বলে না কেন? ফ্রেঞ্চ বলে না কেন?

প্রশ্নগুলি রুমীকে নয়, তাই রুমী চুপ করে থাকে। তাড়াতাড়ি চা খেতে গিয়ে তার জিভ গেছে পুড়ে, রাগটা উঠছে এই লোকটার উপর। লোকটা হঠাৎ দুই হাত মাথার উপরে তুলে নাচার ভঙ্গি করলো, ইংরেজী বলে কারণ তাদের ব্রিটিশ বাবারা ইংরেজীতে কথা বলেন। তারা তিনশো বছর তাদের পাছায় লাথি মেরে গেছেন, এখন তাদের ভাষায় কথা না বললে চলে কেমন করে? কর্তায় কইছে শালার ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই!

লোকটা হঠাৎ তার দিকে ঘুরে বললো, ঐ ব্রিটিশ বাবারা কি তাদের মানুষ বলে জানতো? জালিয়ানওয়ালা বাগে ডায়ার যখন চারশো লোককে কুত্তার মতো গুলি করে মেরে নিজের দেশে ফিরে গেছে তখন তার দেশের লোক কি করেছিল?

রুমীর চা শেষ। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, কি করেছিল?

ব্রিটিশেরা চাঁদা তুলে ডায়ারকে ছাব্বিশ হাজার পাউণ্ড উপহার দিয়েছিল। আর আমরা এখনো সেই ব্রিটিশের ইয়ে ধরে লাফাই। লোকটা অশ্লীল একটা কথা বলে মাটিতে একদলা থুতু ফেললো।

রুমী আর দাঁড়ালো না, পয়সা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে এলো। লোকটার পুরোপুরি মাথা খারাপ।

পরের কয়দিন কিন্তু ঘুরেফিরে লোকটার কথাগুলি মনে হতে থাকে রুমীর। বিশেষ করে সেই ইংরেজটার কথা, এদেশের মানুষকে খুন করেছিল বলে যাকে নিজের দেশের লোকেরা খুশি হয়ে চাঁদা তুলে টাকা উপহার দিয়েছে। কথাটি কতটুকু সত্যি জানার জন্যে ওর ভিতরটা উশখুশ করতে থাকে। কাউকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই, ক্লাসের বন্ধু বান্ধবেরা তার মতোই ইতিহাস বইয়ে শুধুমাত্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গুণপনা আর বীরত্বের কথা পড়ে এসেছে। সত্যি কথাগুলো কোথাও লেখা নেই। রুমী কথা প্রসঙ্গে ফিটফাট ছেলেগুলিকে জিজ্ঞেস করে একদিন, তারাও কিছু জানে না। একজন শুধু বললো টাগোর নাকি ঐ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদস্বরূপ নিজের স্যার উপাধি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। রুমী স্কুলে শিখেছিল প্রপার নাউনের নাকি ইংরেজী হয় না, কিন্তু ঠাকুরের ইংরেজী কেমন করে টাগোর হল? রুমী অবাক হলো আগে কখনো ওর এই প্রশ্নটি মনে হয়নি কেন ভেবে।

কয়দিন পর এক বিকেলে কোনো কাজ খুঁজে না পেয়ে সে পাবলিক লাইব্রেরিতে 'পাক ভারতে ব্রিটিশ উপনিবেশ' নামে একটা বই বের করে পড়তে বসে যায়। রাতে পরীক্ষার পড়া আছে তাই বেশিক্ষণ পড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হলো না। এমনিতেও তার পাঠ্য বই এবং পত্রপত্রিকা ছাড়া আর কিছু পড়ার অভ্যাস নেই, একটা কথা তিন চার বার পড়ে বুঝতে হয়। সন তারিখ দিয়ে কণ্টকিত ইতিহাস পড়ে কিছু বুঝে ওঠাও মুশকিল। রুমী ঘণ্টা দুয়েক চেষ্টা করে খানিকটা বিরক্ত হয়েই উঠে এলো। প্রথম যে ইংরেজ মোগল বাদশাহদের সুনজরে পড়ার চেষ্টা করেছিল সে-ব্যাটা পরিষ্কার জোচ্চোর ছিল, দুই ঘণ্টা পড়ে এইটুকু মাত্র জ্ঞান লাভ হয়েছে। ফিরে যাবার সময় রুমী ঠিক করে এই শেষ, আর সে বাজে সময় নষ্ট করবে না। কবে কখন কোন্ ইংরেজ কার কি ক্ষতি করেছে তাতে তার কি?

পরদিন বিকালে কিন্তু রুমী আবার পাবলিক লাইব্রেরিতে ফিরে এসে ঠিক ঐ বইটা খুঁজে বের করে।

সেদিন রুমী লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে আসে অনেক রাতে, লাইব্রেরি বন্ধ হয়ে যাবার পর। পরীক্ষার পড়া আজ আর হলো না, কিন্তু তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না। সে মাঝে মাঝেই এরকম ছুটি নেয়, বিশেষ করে পরীক্ষার আগে। পড়ার চাপটা মাঝে মাঝে অন্য কিছু করে বের করে দিতে হয়। আজ অবশ্যি অন্য ব্যাপার। সিপাহী বিদ্রোহের পুরোটা শেষ না করে সে কিছুতেই উঠে আসতে পারছিল না। ও জানতো না ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভুত্ব দূর করার শেষ চেষ্টাকে ইংরেজরা কি নির্মম ভাবে দমন করেছিল। বিদ্রোহী সিপাহীদের ফাঁসী দিয়ে হত্যা করেই সন্তুষ্ট হয়নি, তাদের মৃতদেহ কানপুর থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত পুরো রাস্তার দু'পাশের গাছ থেকে ঝুলিয়ে রেখেছিল। নীলক্ষেতের অন্ধকার রাস্তায় বড় বড় গাছগুলির নিচে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রুমীর মনে হয় সে বুঝি

কানপুরের রাস্তা ধরে হাঁটছে, আর দু'পাশের গাছ থেকে বিদ্রোহী সিপাহীদের মৃতদেহ ঝুলছে—প্রচণ্ড রাগে রুমীর দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়।

রুমীর পরিবর্তন হয় খুব তাড়াতাড়ি। শুধুমাত্র পাক ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস পড়েই ওর কাছে অনেক কিছু পরিষ্কার হয়ে যায়। ইংরেজদের দুইশো বছরের শাসন এদেশের মানুষের মনোভাবকে কি রকম ভাবে নষ্ট করেছে সে প্রথমবার বুঝতে পারে। এখনো কেউ ইংরেজী লিখতে গিয়ে ভুল করলে তার লজ্জায় মাথা কাটা যায়, কিন্তু বাংলা লিখতে ভুল করলে ভিতরে এতটুকু অপরাধবোধ পর্যন্ত জন্মায় না। যে-সব ছেলেদের দেখলে এক সময় রুমী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতো আজকাল তাদের দেখলে তার ঘেন্নায় বমি আসতে চায়। আরও অনেক ব্যাপারেই রুমীর ধারণা আজকাল স্পষ্ট হয়ে আসছে। আগে রাজনীতি নিয়ে কখনো মাথা ঘামায়নি, ক্লাসের যে কয়টা ছেলে রাজনীতি করতো তাদের জন্যে ওর অনুকম্পা হতো, আজকাল তাদের সে রীতিমত শ্রদ্ধা করা শুরু করেছে। ভুল হোক আর শুদ্ধ হোক, তারা দেশের জন্যে নিজেদের সময়, শক্তি, সামর্থ্য এমন কি ভবিষ্যৎ পর্যন্ত নষ্ট করতে প্রস্তুত। মুক্তিযুদ্ধের সময় তার বয়সী ছেলেরা কিভাবে দেশের জন্যে যুদ্ধ করেছে সে খানিকটা বুঝতে পারে। নিজের দেশকে নিয়ে তার ভিতরে গর্ব হতে থাকে, গোপন প্রেমের মতো সেটা ওকে আশ্চর্য ভাবে আনন্দ দেয়।

আবার একদিন সেই অভদ্র মাথা খারাপ লোকটির সাথে দেখা হলো রুমীর। দেখা হলো সেই একই জায়গায়, একই ভাবে, লোকটা গম্ভীর মুখে নির্বিকার ভাবে গাঁজা ভরা সিগারেট টানছে। আজকে কেন জানি রুমীর লোকটাকে এতোটা খারাপ লাগলো না, সামনে বসে বললো, ভালো আছেন?

মাথা নেড়ে হাসলো লোকটি যেন কতকালের চেনা। রুমী বুঝতে পারে লোকটি তাকে চেনেনি, চেনার কথা না। চায়ে চুমুক দিয়ে রুমী জিজ্ঞেস করলো, মনে আছে একদিন দুজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তাদের দাদারা কি করে?

মনে পড়ার সাথে সাথে কৌতুকে লোকটার চোখ নেচে ওঠে, দশ টাকা বাজি! অন্তত একটার বাবা গয়লা না হয় ধোপা...

রুমী একটু হেসে প্রসঙ্গটা পাল্টানোর জন্যে বলে, আপনি ডায়ারের কথা বলেছিলেন মনে আছে? যে জালিয়ানওয়ালা বাগে...

বলেছিলাম নাকি?

হ্যাঁ। ডায়ারকে তো লণ্ডনে গুলি করে মেরেছিল।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। উধম সিং, উধম সিং! অন্য ডায়ারকে মারতে পারেনি ওই ব্যাটা আগেই মরে গেছে। একই সময়ে একই জায়গায় দুই কুত্তার বাচ্চা দুইটার নামই এক! লোকটা হঠাৎ কথা বন্ধ করে ঘুরে ভালো করে রুমীকে দেখলো, তোমার কি ইতিহাসে খুব উৎসাহ?

না, খুব নয়। আসলে সেদিন আপনার মুখে জালিয়ানওয়ালা বাগের কথা শুনে একটু পড়ে দেখছিলাম।

লোকটার মুখ খুশিতে ছেলেমানুষের মতো হয়ে ওঠে, আমার কথা শুনে? সত্যি? তুমি আরও পড়তে চাও? কি পড়বে বলো?

এইভাবে কিবরিয়া ভাইয়ের সাথে পরিচয় রুমীর।

কিবরিয়া ভাইয়ের কোনো ভালো গুণ নেই, তিনি স্বার্থপর এবং হিংসুটে। পৃথিবীর কোনো লোককে তিনি পছন্দ করেন না। তিনি ভীষণ সাম্প্রদায়িক। বয়স্ক লোকদের মাঝে হিন্দুবিদ্বেষ বিচিত্র নয়, কিন্তু কিবরিয়া ভাইয়ের ভিতর এই বয়সে এতো হিন্দু বিদ্বেষ কিভাবে গড়ে উঠেছে বোঝা মুশকিল। তিনি যে শুধু সাম্প্রদায়িক তাই নয় তার প্রখর আঞ্চলিকতাবোধ! কোনো কোনো জেলার লোকজনের সাথে তিনি কথা পর্যন্ত বলতে রাজি নন। দেশের প্রায় সব ক'জন বুদ্ধিজীবীকে তিনি উঠতে বসতে মুখ খারাপ করে গালি দেন। কে কবে কখন কি ধরনের নোংরামি করেছিল সব তার নখদর্পণে। নিজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কাজেই মনে করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স্ক শিক্ষকদের দুবেলা মুণ্ডুপাত করার অধিকার আছে তাঁর। সবসময়েই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে কথা বলেন, তাই কেউ প্রতিবাদ পর্যন্ত করতে পারে না। এমনিতে খিটখিটে এবং বদমেজাজী, সাধারণ লোকজনের জন্যে কোনো সম্মানবোধ নেই। রুমী নিজে কিবরিয়া ভাইকে এক রিক্সাওয়ালার সাথে কথা কাটাকাটি করে চড় মারতে দেখেছে। তারপর সমস্ত রিক্সাওয়ালারা একত্র হয়ে উল্টে কিবরিয়া ভাইকে সে কি মার! রুমী কোনমতে সেবার প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে। এরপর থেকে তিনি রিক্সাওয়ালাদের দুই চোখে দেখতে পারেন না। কিবরিয়া ভাইয়ের বয়স খুব কম নয়, কিন্তু এখনো বিয়ে করেননি, রুমীর ধারণা কোনো মেয়ে বিয়ে করতে রাজি হয়নি। জগৎ সংসারের ভালোমন্দ সবকিছুর উপরে এরকম খেপে থাকা লোক রুমী আগে কখনো দেখেনি।

কিবরিয়া ভাইয়ের একটি ব্যাপার অবশ্যি প্রশংসা করার মতো, সেটি হচ্ছে তাঁর পড়াশোনা। গল্প, কবিতা এবং উপন্যাস ছাড়া আর সব ধরনের বই পড়ায় তাঁর সমান উৎসাহ। এমন কোনো বিষয় নেই যা সম্পর্কে তিনি পড়েননি এবং তাঁর বেশ ভালো ধারণা নেই। এতে অবশ্যি লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশি, তর্কবিতর্ক কথা কাটাকাটিতে তিনি প্রতিপক্ষকে চেপে ধরে তাঁর সমস্ত জ্ঞান ভাণ্ডার এত নির্দয়ভাবে ব্যবহার করেন যে প্রতিপক্ষ কখনো তাঁকে ক্ষমা করতে পারে না। রুমী এখন পর্যন্ত একটি লোকও খুঁজে পায়নি যে কিবরিয়া ভাইকে পছন্দ করে বা যাকে কিবরিয়া ভাই পছন্দ করেন। সে নিজে তাঁর থেকে অনেক ছোট বলে কিবরিয়া ভাই কখনো তার সাথে লাগেননি। রুমী যে কিবরিয়া ভাইকে খুব পছন্দ করে তা নয়, কিন্তু একজন মানুষকে ভালো ভাবে বুঝে নিলে তখন তার খারাপ আর ভালো কিছুতেই কিছু এসে যায় না। তাছাড়া কিবরিয়া ভাইয়ের সাথে কথা বলায় একটা আনন্দ আছে, অনেকটা পরচর্চার আনন্দের মতো। কখন কি পড়তে হবে এবং কোন্ বইয়ে কি পাওয়া যাবে কিবরিয়া ভাই খুব ভালো বলে দিতে পারেন। তিনি নিজে রুমীকে অনেক বই জোগাড় করে দিয়েছেন যেগুলি তার পক্ষে পাওয়া অসম্ভব ছিল।

কিবরিয়া ভাইয়ের সাথে পরিচয় হওয়ার পর রুমী অনেক যত্ন করে পাঠ্য বইয়ের বাইরে পড়াশোনা শুরু করেছে। পৃথিবী সম্পর্কে ওর ধারণা আজকাল পাল্টে গেছে। আগে মনে করতো যা ছাপা হয় বিশেষ করে বিদেশী পত্রপত্রিকায় সব বুঝি সত্যি। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সংবাদপত্রগুলি যে খুব যত্ন করে পৃথিবীর খবর নিজেদের মনমতো করে পরিবেশন করে সাধারণ মানুষদের একটা ছাঁচের ভিতর ফেলে দেয়ার চেষ্টা করছে বোঝার

পর সে তাদের অবিশ্বাস করা শুরু করলো। বিদেশীরা ভালো বললে ভালো এবং বিদেশীরা খারাপ বললে খারাপ এই ধরনের মতাবলম্বী লোকজনের সংখ্যা দেখে রুমী এই প্রথমবার বুঝতে পারে এদেশের সত্যিকার সমস্যা কাদের মাঝে।

****
****
****
****

Please Only Read Ebook but don't try to print that.

If You do that both the writer & the Editor will be loser & then both the quality & quantity of books will be degraded.

RONY
shaibalrony@yahoo.com
01914882384

www.banglabook.com

দুই

পরীক্ষার আর ঠিক দশ দিন বাকি। রুমী নিজের পড়াশোনাতে খুব সন্তুষ্ট। অন্যদের মতো সে নির্দিষ্ট কয়টা প্রশ্নের উত্তর না শিখে পুরো বই পড়ছে। যদিও আজকাল সে প্রচুর বাইরের জিনিস পড়াশোনা করে, সপ্তাহে চারদিন দুটি করে টিউশানি করে তবু তার সময়ের অভাব হয়নি। পড়াশোনা একেবারে নেশার মতো হয়ে গিয়েছে। সবকিছু প্রথমবার পড়ে শেষ করতে অনেক সময় নেয়, দ্বিতীয়বার পড়তে আর ততো সময় নেয় না। তৃতীয়বার পড়তে শুধু যে সময় আরও কম লাগে তই নয় পড়ে প্রচণ্ড একটা আনন্দ হয়। রুমী ছোট একটা নোট বইয়ে বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন অংশের নাম লিখে তার পাশে তারকা চিহ্ন দিয়ে পড়াশোনার হিসাব রাখছে। তিন তারকা মানে ভালো পড়া হয়েছে, দুই তারকা মানে মাঝারি, এক তারকা মানে খারাপ। তার নোট বইয়ে তিন তারকা খুব বেশি, দুই তারকা খুব কম, এক তারকা নেই বললেই চলে। বাকি দশ দিনে সে তিন তারকাগুলিকে চার তারকা করে ফেলবে, না দুই এবং এক তারকাকে তিন তারকাতে নিয়ে আসবে ঠিক করতে পারছিল না। গত কয়েক বছরের প্রশ্ন যাচাই করলেই বোঝা যায় কোনো কোনো পরিচ্ছেদ না পড়লেও চলে, রুমীর নোট বইয়ে সেগুলিই দুই এবং এক তারকা হিসেবে রয়েছে—অন্যেরা সেগুলি মোটেও পড়ছে না। রুমীর নীতিবোধ আজকাল প্রখর হয়ে উঠছে, প্রশ্ন বেছে পড়ে ভালো করাকে সে জোচ্চুরি মনে করে। একটা ভালো স্কলারশিপ ছাড়া আর কিছুতে তার আকর্ষণ নেই, অন্তত সেটাই সে নিজেকে বোঝায়।

আজ তাই সে একেবারে নতুন একটা জিনিস পড়া শুরু করেছে। কিন্তু খানিকক্ষণ পড়েই সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে—গত কয়েকদিন পরিশ্রম একটু বেশি হয়ে গেছে। একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে রুমী ঘর থেকে হাঁটতে বের হয়। সে নতুন সিগারেট খাওয়া শিখছে, এখনো সিগারেট ভালো লাগা শুরু হয়নি, খেতে বেশ কষ্টই হয়। সাধারণতঃ ভাত খাবার পর সে সিগারেট খেতে চেষ্টা করে, আজ কি মনে করে এখনই একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। প্রথম দু-তিন টান ওর খারাপ লাগে না, কিন্তু তারপরই গা গুলিয়ে ওঠে। সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে রাস্তা ধরে উদ্দেশ্যহীন ভাবে হাঁটতে শুরু করলো। কারো বাসায় যাওয়া যায় কিনা ভাবলো, কিন্তু পরীক্ষার পড়া নিয়ে সবাই ব্যস্ত এখন, যাওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। ঠিক তক্ষুণি তার "বিখ্যাত জ্যোতিষী জোয়ারদারের" কথা মনে পড়লো। বেশ অনেকদিন থেকেই খবরের কাগজে প্রেম-ভালোবাসা, মামলা-মোকদ্দমা, শিক্ষা-সাফল্য, বিদেশ-ভ্রমণ সম্পর্কে জানার "অপূর্ব সুযোগের" বিজ্ঞাপন দেখে আসছিল। সে কোনদিন এসব ব্যাপারে উৎসাহী নয়, কিরোর হাত দেখার বই বারবার পড়েও কোন্‌টা আয়ু রেখা কোন্‌টা হৃদয় রেখা সে মনে রাখতে পারে না। কিন্তু এই জ্যোতিষীর কথা ভিন্ন, তার এক বন্ধু বলেছে মাত্র দশ টাকার বিনিময়ে জ্যোতিষী নাকি সবকিছু বলে দিতে পারে। রুমীর বিশ্বাস হয়নি, কিন্তু তার বন্ধুটি খোদার কসম খেয়ে বলেছে যে ছেলেবেলায় তার অ্যাপেনডিসায়টিস অপারেশনের কথাটিও নাকি জ্যোতিষী দিন-তারিখ সহ বলে দিয়েছে। সেই থেকে ওর ইচ্ছে ব্যাপারটি নিজে গিয়ে দেখে, কিন্তু যাওয়া হয়নি। এখন, হঠাৎ করে,

সেখানে যাওয়ার কথা মনে হলো। পকেটে কিছু টাকা আছে, পড়ায় মন বসছে না—এর থেকে ভালো সময় আর হবে না। বাস স্টপে এসে দাঁড়ালো রুমী।

জোয়ারদারের নাম এবং বিজ্ঞাপনের ধরন দেখে রুমীর ধারণা হয়েছিল সাদাসিধে একজন বুড়োমানুষ নিজের বসার ঘরে লোকজনের হাত দেখে কিছু বাড়তি পয়সা রোজগারের চেষ্টা করে, তাই ঠিকানা খুঁজে বের করে জোয়ারদারের ঘর দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। মতিঝিলের এক সম্ভ্রান্ত এলাকায় চোদ্দ তলা দালানের সাত তলায় চমৎকার একটা ঘর আর ছোট একটা বারান্দা নিয়ে জোয়ারদারের হাত দেখার জায়গা। বারান্দায় বসে জোয়ারদার হাত দেখে। একটা পর্দা দিয়ে সেটা ঘর থেকে আলাদা করে রাখা। ঘরটিতে একটা ছোট টেলিভিশন চলছে। এক কোনায় চায়ের সরঞ্জাম এবং কেতলিতে ফুটন্ত পানি ঃ যারা চায় চা তৈরি করে নেবে। চমৎকার সোফা এবং টেবিলে দেশী বিদেশী রঙচঙে পত্রপত্রিকা। ঘরে হালকা আলো। টেলিভিশনের শব্দ কমে এলেই শোনা যায় কোথা থেকে যেন মিষ্টি সেতারের শব্দ ভেসে আসছে। দেখেশুনে রুমী মুগ্ধ হয়ে যায়। যে লোক হাত দেখা পয়সা দিয়ে এতোসব আয়োজন করে ফেলতে পারে সে হয়তো সত্যিই হাত দেখতে পারে। এই প্রথম রুমীর লোকটার প্রতি একটু বিশ্বাস জন্মালো।

বাইরে অন্ধকার নেমে এসেছে। ঘরের ভিতর এখন রুমী ছাড়া আরও দুজন। তারা ওর পরে এসেছে। রুমীর ঠিক আগে যে এসেছে সে এখন পর্দার ওপাশে হাত দেখাচ্ছে, এর পরেই রুমী। একজন কুড়ি থেকে পঁচিশ মিনিট করে সময় নেয়। রুমীর ঘণ্টাখানেক সময় এর মাঝে নষ্ট হয়ে গেছে, হাত দেখিয়ে ফিরে যেতে আরও দুই ঘণ্টা। ওর বাসা অনেকটা দূর, একবার বাস বদলাতে হয়। পরীক্ষার আগে এভাবে এতোটা সময় নষ্ট করা ভালো হলো কিনা রুমীর সন্দেহ হতে থাকে।

পাশের ঘর থেকে জ্যোতিষী জোয়ারদার এবং তার সাথে রুমীর আগের লোকটি বের হয়ে আসে। লোকটির মুখ একটু বিমর্ষ, কে জানে ভাগ্য গণনায় কি বের হয়েছে! জোয়ারদার রুমীর দিকে তাকিয়ে বললো, এরপর কে, তুমি?

রুমী মাথা নাড়লো। এসো, বলে জোয়ারদার পর্দা তুলে ওকে ভিতরে ডাকলো।

কি হলো কে জানে হঠাৎ রুমী প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গেল। ওর মনে হতে লাগলো পর্দার ওপাশে একটা ভয়ানক অশুভ কিছু অপেক্ষা করে আছে। ওর ভিতর থেকে কে যেন ওকে বলছে, পালা পালা বাঁচতে হলে পালা...

রুমীর হৃৎস্পন্দন বেড়ে যায়, হঠাৎ সে কুলকুল করে ঘামতে থাকে। জোয়ারদার ওর চোখের দিকে তাকিয়ে ছিল, ঠাণ্ডা স্বরে বললো, এসো।

রুমীর সারা শরীর আবার কাঁটা দিয়ে ওঠে, কি নিষ্করুণ তীব্র দৃষ্টি! শুকনো গলায় ঢোক গিলে বললো, আমি আজ বরং যাই, আরেকদিন আসবো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে, এমনিতেই অনেক দেরি হয়ে গেছে।

জোয়ারদার এগিয়ে এসে ওর হাত ধরে। শক্ত লোহার মতো হাত, কিন্তু মরা মানুষের মতো ঠাণ্ডা। রুমীকে প্রায় টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলে, সে কী! চলে যাবে কেন? বেশিক্ষণ লাগবে না—এসো।

পর্দার এপাশে ছোট বারান্দা, মাঝখানে ছোট একটা টেবিল। টেবিলের দুই পাশে দুটি চেয়ার। টেবিলের উপর একটা টেবিল ল্যাম্প, একটা টেলিফোন আর একটা বড়

ম্যাগনিফাইং গ্লাস, আর কোথাও কিছু নেই। বারান্দায় রেলিঙের উপর দিয়ে ঢাকা শহর দেখা যায়। নিওন লাইট জ্বলছে নিভছে, মাঝে মাঝে গাড়ির শব্দ। মতিঝিলের এই এলাকাটা সন্ধ্যার পর এমনিতে খুব চুপচাপ হয়ে পড়ে।

জোয়ারদার একটা চেয়ারে বসে তাকে অন্যটাতে বসতে ইঙ্গিত করে। রুমী যন্ত্রের মতো চেয়ারে বসে নিজেকে শান্ত করার চেষ্টা করতে থাকে। খামোকা আমি ভয় পাচ্ছি, রুমী নিজেকে বোঝাতে শুরু করে, এই লোক আমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। বাইরে আরও দুজন লোক বসে আছে, আমার ভয় কিসের? লোকটার বিজনেস হাত দেখা, হাত না দেখে ছাড়তে চাইবে কেন? রুমী ঘামে ভেজা ডান হাতটা টেবিলের উপর মেলে দেয়।

জোয়ারদার বললো, বাম হাতটাও দেখি। রুমী তার বাম হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

রুমীর মেলে রাখা দুই হাত নিজের দিকে টেনে এনে এক পলক দেখে জোয়ারদার হাতে ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা তুলে নেয়। রুমী জানতেও পারলো না জোয়ারদার যে-রেখাটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নিল সেটি তার পুরো ভবিষ্যৎকে সেই মুহূর্তে কি ভয়ানক ভাবে পাল্টে দিল।

অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে হাত দুটি দেখলো জোয়ারদার। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলো, কি নাম তোমার?

রুমী নিজের নাম বলে।

হাত দেখাতে এসেছ কেন?

এটা আবার কোনো প্রশ্ন হয় নাকি? লোকজন হাত দেখাতে না এলে ওর ব্যবসা চলবে কেমন করে? মুখে বললো, এমনি এসেছি, সবাই যেজন্যে আসে।

ও। জোয়ারদার আবার চুপ করে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। কি ভয়ানক নিষ্করুণ দৃষ্টি! সারা মুখে খোঁচা খোঁচা লালচে দাড়ি, শুকনো টেনে থাকা মুখ ঝাঁকড়া লালচে চুল ঝকঝকে সাদা দাঁত আর সবকিছু ছাপিয়ে জ্বলজ্বল করছে তার চোখ দুটি।

জোয়ারদার হঠাৎ টেলিফোনটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে রিসিভার তুলে সাবধানে আস্তে আস্তে ডায়াল করে রুমীর দিকে তাকিয়ে বললো, আমি এই টেলিফোনটা শেষ করেই শুরু করছি।

ওপাশ থেকে একটা মেয়ে টেলিফোন ধরলো বলে মনে হলো। জোয়ারদার গলা নামিয়ে কথা বলতে শুরু করে, রুমী চেষ্টা করেও কিছু শুনতে পায় না। কথা বলার ভঙ্গি শুনে মনে হয় কাউকে যেন কিছু একটা নির্দেশ দিচ্ছে। রুমীর খুব অস্বস্তি বোধ হতে থাকে, কেন জানি ওর মনে হয় ওকে নিয়েই কথা বলছে ওরা।

টেলিফোন শেষ করেও জোয়ারদারের শুরু করার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না, অন্যমনস্ক ভাবে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। রুমী একটু অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি দেখলেন হাতে?

ও, আচ্ছা। একটু নড়েচড়ে বসে জিজ্ঞেস করলো, তোমার জন্ম-তারিখ কত? ডিসেম্বরের কত তারিখ?

তেইশ।

বয়স কত?

রুমী নিজের বয়স বলে।

জোয়ারদার মাথা নেড়ে বাইরে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে শুরু করে। অদ্ভুত একটা গলার স্বর, একঘেয়ে ক্লান্ত আবেগহীন। কথা যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে অনেকটা দৈববাণীর মতো, থেকে থেকে রুমী অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে।

খুব ছেলেবেলায় তোমার বাবা মারা গেছেন। তাকে খুন করা হয়েছিল...হ্যাঁ, ওর বাবাকে খুন করা হয়েছিল। সবাই জানে ওর বড় চাচা খুন করিয়েছিলেন লোক লাগিয়ে। কোনো প্রমাণ নেই, কিন্তু সবাই জানে। জমি নিয়ে গোলমাল ছিল অনেকদিনের। হাজীপুরের আলিমুল্লা হাজার টাকা পেলে এক কোপে গলা নামিয়ে দেয়। বড় চাচা পাঁচশো দিয়ে বায়না করেছিলেন, কাজ শেষ হবার পর বাকি পাঁচশো। কাজ শেষ করে সেই রাতেই আলিমুল্লা বড় চাচাকে ডেকে তুললো। হাতে লম্বা দা, তখনো রক্ত লেগে আছে। বড় চাচা তাড়াতাড়ি বাকি টাকা দিয়ে দিলেন। আলিমুল্লা তিন মাসের জন্য অদৃশ্য হয়ে গেল। তিন মাস পরে সবাই ভুলে গেলে সে আবার ফিরে এলো। শুকনো গিরগিটির মতো চেহারা, কালো কুচকুচে গায়ের রং, পান খেয়ে দাঁত লাল। সবাই জানে হাজার টাকা দিলে আলিমুল্লা গলা নামিয়ে দেয়। রাতের অন্ধকারে ওর বাবার গলা নামিয়ে দিয়েছিল আলিমুল্লা। কি নিখুঁত হাত, পাশে ওর মা শুয়ে ছিলেন, তাঁর গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। সারা শরীর শুধু রক্তে ভিজে গিয়েছিল। মা চিৎকার করে উঠে বসেছিলেন, আর ঘুম ভেঙে উঠে রুমী দেখেছিল, ওর মায়ের সারা শরীর রক্তে লাল। ও ভেবেছিল ওর মাকে কেউ কেটে ফেলেছে, কিন্তু ওর মায়ের কিছু হয়নি। ওর বাবাকে কেটে ফেলেছিল। নিখুঁত নিশানা, ঠিক গলাটা একে কোপে দুই ফাঁক। রুমী অনেকদিন ভেবেছিল ওর হাজার টাকা হলে আলিমুল্লাকে দিয়ে বলবে বড় চাচার গলা নামিয়ে দিতে। ও ঠিক নামিয়ে দিত। কিন্তু বড় চাচা মরে গেলেন, এমনিতে ভুগে ভুগে মরে গেলেন। শরীরের মাংস পচে খসে খসে পড়তো আর সারা রাত যন্ত্রণায় কাটা মাছের মতো লাফাতেন। সবাই বলতো বদ দোয়া লেগেছে, এতিমের বদ দোয়া...

তোমার মায়ের সাথে তোমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে খুব ছেলেবেলায়।

...মায়ের চেহারা হয়ে গেল ডাইনীর মতো। রুমী কাছে যেতে ভয় পেতো। দাঁতে দাঁত ঘষে ফিট হয়ে যেতেন, সবাই বলতো জিনে ধরেছে। এতো এতো তাবিজ দিল গলায়, মা টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেলতেন। একদিন নানা নৌকো করে এসে তার মাকে নিয়ে গেলেন। শুধু মাকে, রুমীকেও না শানুকেও না। রুমীর কি কান্না, শানু তখন কিছু বোঝে না, কিন্তু রুমীর কান্না দেখে তারও চিৎকার করে কান্না! নৌকো করে নানা মাকে নিয়ে গেলেন, মা পাথরের মূর্তির মতো নৌকোয় বসে রইলেন, একবার ঘুরেও তাকালেন না। রুমী নৌকোর সাথে সাথে নদীর তীরে তীরে চিৎকার করে ছুটে যেতে লাগলো। ওর ছোট চাচা ওকে ধরে নিয়ে এলেন, বললেন ওর মা আবার ফিরে আসবেন। রুমী কিন্তু জানতো আর আসবেন না। ওর মা আসলেও আর আসেননি। অন্য জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে, কেউ বলেনি, কিন্তু রুমী জানে...

তোমার কোনো আপনজন নেই।

...কে বলেছে নেই? নিশ্চয়ই আছে, শানু আছে! শানু-শানু-শানু গুটি গুটি হাঁটতো উঠনের নেড়ে দেয়া ধানের মাঝে। মোরগগুলিকে তাড়া করতো, মোরগগুলিও বুঝতো ও

শানু, তাই ভয় পেতো না মোটেই। শানুর গা ঘেঁষে এসে ধান খেয়ে যেতো। শানু কিছু বুঝতো না, ওর মা ওদের ছেড়ে চলে গেছেন তাও বুঝতো না। থালা উল্টে ভাত ছড়িয়ে দিতে মাটিতে, তারপর খুঁটে খুঁটে খেতো মাটি থেকে তুলে। শুধু হাসতো ফোকলা দাঁত বের করে। কিছু বুঝতো না শানু, এতো দুঃখ ওদের তাও বুঝতো না। তারপর একদিন শানুর বিয়ে হয়ে গেল। রুমী জানতেও পারেনি কখন শানু বড় হয়ে গেছে, শান্ত হয়ে গেছে, দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে চুপচাপ ওকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। বিয়ের রাতে শানু ওকে সালাম করতে এলো। বড় ফুপু বললেন, ভাইরে শেষবার সালাম করে নে রে, শানু। শুনে হঠাৎ রুমীর বুকটা হা হা করে ওঠে। শানুর ওকে জড়িয়ে ধরে কি কান্না! বলতে চাইছিল, আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও দাদা, আমি বিয়ে করবো না। রুমী জানে তাই বলতে চাইছিল, কিন্তু বলেনি। কেন বলবে? ভালো প্রস্তাব, ভালো বংশের ছেলে, দোকান আছে সদরে। কতদিন আর চাচাদের সংসারে থাকবে? শানু চলে গেল। কেমন আছে এখন শানু? কতদিন যোগাযোগ নেই—কতদিন! তিন বছর? চার বছর?...

অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছো তুমি। কারো কোনো সাহায্য ছাড়া, একা একা।

...একা একা? হবে হয়তো। বড় ফুপু বললেন, ঢাকা যাবি আমার সাথে? নাইট কলেজে পড়বি। আমার বাজারটা, ইলেকট্রিক বিলটা করে দিবি, তোর ফুপা পারলে প্রেসে একটা চাকরি খুঁজে দেবে। বিলু রীতার পড়াশোনাটা দেখবি। রুমী রাজি হলো। ফুপু এসে কাজের ছেলেটা ছাড়িয়ে দিলেন। রুমী চরকির মতো ঘুরতে থাকে, শখ ছিল পড়াশোনা করে বড় হবে কিন্তু ও কাজের ছেলে হয়ে গেল। বাজার করে, বাসন মাজে, কাপড় ধোয়। ময়লা কাপড় পরে, উচ্ছিষ্ট তরকারি দিয়ে একগাদা ভাত খায়, রাতে রান্নাঘরে মাদুর পেতে ঘুমায়। তখন ওর পরীক্ষার ফল বের হলো। স্টার মার্ক পেয়েছে, চার বিষয়ে লেটার। ক্লাস টীচার সেই গ্রাম থেকে দেখা করতে এলেন একটা নতুন এ. সি. দেবের ডিকশনারি নিয়ে। ওর অবস্থা দেখে একেবারে চুপ মেরে গেলেন, এমন কি ডিকশনারিটা দেয়ার কথা পর্যন্ত মনে থাকলো না। বসার ঘরে সারাদিন বসে রইলেন কিছু না খেয়ে। সন্ধ্যায় ফুপা এলে তার সাথে কথা বললেন, কি বললেন কে জানে ওর ক্লাস টীচার চলে যেতেই ফুপা চিৎকার করে গালি দিতে শুরু করলেন ফুপুকে, তোমার চোদ্দগুষ্ঠির কেউ প্রাইমারি পর্যন্ত পাস করে নাই, আর তুমি আমাকে বলোনি পর্যন্ত যে রুমী ম্যাট্রিক পাস করেছে, স্টার মার্ক, চার সাবজেক্টে লেটার। ওকে দিয়ে তুমি বাসন মাজাও, বাজার করাও। তোমার বাপের গোলাম নাকি? স্কলারশিপ পাবে মাসে দেড়শো টাকা, কয়দিন পরে তোমাকে বাঁদী রাখবে সেটা খেয়াল আছে? ফুপু প্রথমে একটা দুটো কথা বলে প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন তারপর ফোঁস ফোঁস করে কাঁদতে লাগলেন। অবস্থা পাল্টে গেল রুমীর, নতুন কাপড় কিনে দিলেন ফুপা, বাইরের ঘরে ওর জন্যে বিছানা পাতা হলো, ঢাকা কলেজে ভর্তি করে দেয়া হলো তাকে। লোকজন এলে ফুপা পরিচয় করিয়ে দিতেন, আমার মেজোশালার ছেলে, চার সাবজেক্টে লেটার, স্টার মার্ক। রুমী অবশ্যি তবু বাজার করে দিত, বিলু রীতার অংক দেখে দিত। স্কলারশিপের টাকা পেয়ে ফুপুকে একটা শাড়ি কিনে দিল, ফুপাকে প্যান্টের কাপড়। তাই পেয়ে কি খুশি! টিউশানি নিল রুমী...

কতক্ষণ ধরে জোয়ারদার কথা বলছিল রুমীর মনে নেই। অন্যমনস্ক ভাবে একঘেয়ে আবেগহীন গলার সুরে রুমীর ভাবনা-চিন্তা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুর্বলতা, আক্রোশ, গোপন কামনা-বাসনার কথা এত অনায়াসে বলে গেল যে রুমীর মনে হতে থাকলো জোয়ারদার নয় সে নিজেই যেন নিজের কথা বলছে। জোয়ারদার কথা বলে সুন্দর ভারি গলায়, নিশ্চিত আত্মবিশ্বাসে। রুমীর ভিতরটা যেন খোলা বইয়ের মতো পড়ে গেল। কখনো কখনো থেমে যাচ্ছিল ঠিক জুতসই শব্দটা না পেয়ে। তখন ধৈর্য ধরে একটার পর একটা শব্দ ব্যবহার করতে থাকে যতক্ষণ না ঠিক শব্দটা খুঁজে পায়।

আস্তে আস্তে রুমী যেন সম্মোহিতের মতো হয়ে গেল। জোয়ারদারের গলার স্বর যেন ভেসে আসছে অনেক দূর থেকে। সাগরের ঢেউয়ের মতো অর্থহীন কিছু শব্দ ওকে স্পর্শ করে যাচ্ছে। জোয়ারদারের চেহারা অস্পষ্ট হয়ে গেল ওর সামনে, কি বলছে কিছু সে বুঝে উঠতে পারছে না। একটি একটি শব্দ সে শুনছে, কিন্তু সব মিলিয়ে তার যেন কোনো অর্থ নেই। যুগ যুগ যেন সে বসে আছে এখানে, এর যেন শুরু নেই, শেষ নেই।

রুমীর চমক ভাঙলো তীব্র একটা আলোর ঝলকানিতে। পর্দা সরিয়ে একটি মেয়ে এসে ঢুকে ছবি তুলেছে, ক্যামেরার ফ্ল্যাশের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে গেছে রুমীর। কিসের ছবি তুলেছে মেয়েটি? রুমী ঠিক বুঝতে পারলো না। মেয়েটি ভিতরে এলো না, জোয়ারদারের দিকে তাকিয়ে বললো, আমি বাইরে আছি। তোমার কাজ শেষ হলে ডেকো।

আমার কাজ শেষ।

রুমী উঠে দাঁড়ালো। পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করে একটা দশ টাকার নোট কিভাবে দেবে বুঝতে না পেরে টেবিলের উপরে রাখলো। কাউকে টাকা দিতে বা কারো কাছ থেকে টাকা নিতে সবসময়েই কেমন যেন অস্বস্তি লাগে। প্রত্যেক মাসে টিউশানির টাকা নেয়ার সময় ওর এই রকম হয়।

জোয়ারদার কিন্তু বেশ সপ্রতিভভাবে নোটটা নিয়ে পকেটে রাখলো। তারপর ড্রয়ার খুলে একটা কাগজ বের করে রুমীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, তোমার নাম ঠিকানাটা লিখে দেবে? আমি সবার নাম ঠিকানা রাখছি রেফারেন্সের জন্যে। তোমার যদি কোনো আপত্তি থাকে তাহলে দরকার নেই।

রুমীর আপত্তি ঠিকই ছিল কিন্তু কেউ এভাবে বললে না করা মুশকিল। একবার ইচ্ছা হলো একটা ভুল ঠিকানা দিয়ে দেয়, কিন্তু জেনেশুনে এত বড় মিথ্যা কাজ কিভাবে করে! নাম ঠিকানা লিখে সে উঠে দাঁড়ায়, জোয়ারদার খুব আন্তরিকভাবে তার সাথে হাত মিলিয়ে বলে, তুমি বলছিলে তোমার দেরি হয়ে গেছে। তুমি যদি চাও ইভা তোমাকে পৌঁছে দিতে পারে।

না, না—রুমী ব্যস্ত হয়ে বললো, আমি একাই যেতে পারবো।

মেয়েটি, যার নাম নিশ্চয়ই ইভা রুমীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় বাসা তোমার?

মালিবাগ।

ওঃ কি সুন্দর করে হেসে উঠলো মেয়েটি, আমি এমনিতে রাজারবাগ যাচ্ছিলাম, চল তোমাকে পৌঁছে দিই।

www.banglabook.com

চমৎকার চেহারা ইভার, চমৎকার শরীরে আরও চমৎকার একটা শাড়ি পরে আছে। কেমন একটা আকর্ষণ আছে মেয়েটার শরীরে একবার চোখ পড়লে আর চোখ সরানো যায় না। চোখের দৃষ্টি কেমন যেন ধারালো, মোটেই মেয়েদের চোখের মতো নয়, সোজাসুজি চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে পারে।

চল যাই, ইভা রুমীকে নিচে নিয়ে যায়। গাড়িতে উঠে সে রুমীর জন্যে দরজা খুলে দেয়। রুমী তার জীবনে গাড়ি চড়েছে খুব কম, হাতে গুণে বলা যায় কয়বার। বড় হয়ে ছাদ খুলে ফেলা যায় এরকম একটা গাড়ি কিনবে—কালো রঙের—এরকম একটা স্বপ্ন ওর বহুদিনের।

ফাঁকা রাস্তায় গাড়িটা ঘুরিয়ে ইভা রুমীকে নিয়ে রওনা দেয়। গাড়িতে মিষ্টি একটা গন্ধ, সুন্দরী মেয়েদের গায়ে বুঝি সুন্দর একটা গন্ধ থাকার নিয়ম! রুমী আড়চোখে ইভাকে চেখার চেষ্টা করে।

কি পড় তুমি? তুমি বলে বলছি বলে কিছু মনে করছো না তা? ইভা একটু হেসে বলে, বয়সে তুমি আমাদের থেকে অনেক ছোট হবে।

না, না মনে করার কি আছে—ভদ্রতার খাতিরে রুমীকে বলতেই হলো। এমনিতে কেউ সোজাসুজি তাকে তুমি বলে সম্বোধন করলে তার মোটেই পছন্দ হয় না। চেহারায় এখনো বয়সের ছাপ পড়েনি, গোঁফটা একটু ঘন হলে সে রাখার চেষ্টা করে দেখতো।

কি পড়ছো বললে না?

রুমী বললো সে কি পড়ছে। পরীক্ষা দেবে তাও বললো।

কবে পরীক্ষা তোমার?

এই মাসের আঠারো তারিখ।

তাই? পরীক্ষা তো এসে গেল।

হুঁ।

ইভা হঠাৎ খিল খিল করে হেসে ওঠে, রুমী অবাক হয়ে তাকায় ইভার দিকে। পড়াশোনা করোনি বুঝি, তাই হাত দেখাতে গিয়েছিলে?

রুমীও হেসে ফেলে, বলে, না তা নয়। পড়া আমার ঠিকই হয়েছে, এমনি খেয়াল হলো তাই গেলাম।

গাড়ি চালাতে চালাতে ইভা ঘুরে রুমীকে দেখলো, কিছু বললো না। বেশ অনেকক্ষণ পর আস্তে আস্তে অনেকটা আপনমনে বললো, খেয়াল হলো তাই গেলে। আশ্চর্য!

এর মাঝে আশ্চর্য কোন্ ব্যাপারটা রুমী বুঝতে পারে না।

রুমীকে ইভা ওর বাসার কাছে নামিয়ে দেয়। রুমী একটু আগেই নেমে পড়তে চাইছিল, কিন্তু ইভা ওকে ঠিক বাসার সামনে না নামিয়ে ছাড়বে না। শুধু তাই নয় ইভা গাড়িতে বসে রইলো যতক্ষণ পর্যন্ত রুমী তার বাসায় গিয়ে না ঢুকছে। এতো রাতে এরকম একটা সুন্দরী মেয়ের গাড়ি থেকে নামছে, ব্যাপারটা কেউ দেখে ফেলছে কিনা এ নিয়ে শঙ্কিত ছিল বলে ও তাড়াতাড়ি বাসায় ঢুকে পড়েছে, তা নইলে ও নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতো যে ইভা কাগজ বের করে ওর বাসার নাম্বারটা টুকে নিয়েছে।

কেউই খেয়াল করলো না গত ছয়মাস থেকে জ্যোতিষী জোয়ারদারের ভাগ্য গণনার যে বিজ্ঞাপনটি দৈনিক পত্রিকাগুলিতে ছাপা হচ্ছিল সেটি পরদিন থেকে বন্ধ হয়ে গেছে।

পাবলিক লাইব্রেরি থেকে বের হয়ে রুমী হেঁটে হেঁটে নীলক্ষেতের ভিতর দিয়ে যাচ্ছিল। ওর এক বন্ধুর বাসায় যাওয়ার কথা, নিউমার্কেট থেকে বাস ধরবে। ওর গা ঘেঁষে একটা হালকা নীল রঙের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে ও লক্ষ্যও করেনি। গাড়ি থেকে মাথা বের করে একটা মেয়ে উচ্চকণ্ঠে ডাকলো, রুমী-রুমী!

রুমী ঘুরে তাকিয়ে দেখে ইভা। অবাক হয়ে কাছে এগিয়ে যায়।

কি খবর তোমার? ইভা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, কোথায় চলেছ?

রুমী একটু থতমত খেয়ে বললো, এই এসেছিলাম একটু লাইব্রেরিতে।

এখন কোথায় যাচ্ছ?

কলেজ গেটের দিকে এক বন্ধুর বাসায়।

চলো পৌঁছে দিই, রুমী কিছু বলার আগেই দরজা খুলে দেয় ইভা।

বাসে যেতে ওর আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় লাগতো, ইভা সেখানে ওকে দশ মিনিটে পৌঁছে দিল। অল্প সময়ে বেশি কথাবার্তা হওয়ার সুযোগ নেই। এর মাঝেই ইভা তার পড়াশোনার খবর নিয়েছে। কবে কোথায় পরীক্ষা তাও জেনে নিয়েছে। রুমী মেয়েদের সাথে কথা বলে অভ্যস্ত নয়, তাই পুরো সময়টুকু একটু আড়ষ্ট হয়েই বসেছিল, কথা যা বলার ইভাই বলেছে। সোহ্‌রাওয়ার্দী হাসপাতালের মোড়ে ওকে নামিয়ে দেয়ার পর ও যেন স্বস্তি ফিরে পেয়েছে।

সে-রাতে ঘুরে ফিরে ওর অনেকবার ইভার কথা মনে পড়লো।

পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে রুমী ওর ক্লাসের ক'জন ছেলের সাথে রাস্তা ধরে হেঁটে যাচ্ছিল। ও খেয়াল করেনি, করলে দেখতে পেতো একটু দূরে গাড়ি নিয়ে বসে আছে ইভা। রুমীকে অন্যদের সাথে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে দেখে ইভা গাড়ি ঘুরিয়ে উল্টোদিকে চলে গেল। একা থাকলে হয়তো আবার রুমীকে গাড়িতে তুলে নিত।

নিউমার্কেটে বইয়ের দোকানে উবু হয়ে বসে রুমী বই দেখছিল, কে যেন ওর খুব কাছে মাথা এনে ডাকলো, রুমী!

রুমী ঘুরে দেখে ইভা। কি খবর—ইভা হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে, ভালো?

হ্যাঁ, এই আর কি!

পরীক্ষা কেমন হলো তোমার?

ভাল।

কি করছো এখানে? যাবে নাকি কোথাও?

নাহ্! সাতটার সময় ওর একটা টিউশানি আছে, এখনো খানিকক্ষণ বাকি সাতটা বাজতে, তাই সময় কাটাচ্ছিল। ইভাকে টিউশানির কথা বলতে ওর লজ্জা করলো, বললো অন্য কাজ আছে। শুনে ইভা আর অপেক্ষা করলো না। মিষ্টি করে হেসে বললো, আসি তাহলে, আবার দেখা হবে।

দেখা হোক কি না হোক বিদায় নেয়ার সময় অনেকেই বলে, আবার দেখা হবে, ওটা একটা কথার কথা।

কিন্তু ইভার কথাটা কথার কথা ছিল না। ও সত্যিই জানতো আবার দেখা হবে। শুধু ইভা নয় আরও অনেকে জানতো আবার দেখা হবে। বহুদিন থেকে ওকে ওরা চোখে চোখে রাখছে। অনেক খুঁজে ওরা রুমীকে পেয়েছে, এখন ওকে কিছুতেই হাতছাড়া করা চলবে না।

রুমী যখন সেটা জানতে পারলো তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।

****
****

If You Try to Share your feelings by exchanging books, Please login to:

www.banglabook.com

তিন

রুমী বহুদিন হলো শানুকে দেখেনি। সেই কবে শানুর বিয়ে হয়ে গেছে তারপর মাত্র একবার দেখা হয়েছে। ক'দিন আগে শানুর স্বামী ঢাকা এসেছিলেন গুড়ের একটা চালান নিয়ে। ছোটখাটো মানুষ, মুখে সব সময়েই ভালো মানুষের মতো একটা হাসি। সদরঘাটের কাছে কি একটা ঘিঞ্জি হোটেলে ছিলেন সপ্তাহখানেক। রুমীকে খুব যত্ন করে হোটেলে নিয়ে শিককাবাব খাইয়েছিলেন। যাবার সময় খুব করে বলেছেন যেতে। রুমী কথা দিয়েছিল পরীক্ষা শেষ হলে যাবে। তখন ভদ্রলোককে শান্ত করার জন্যেই বলেছিল, কিন্তু পরীক্ষা শেষ হবার পর ও সত্যিই ঠিক করলো যাবে। হকার্স মার্কেট ঘুরে ঘুরে সে শানুর জন্যে একটা শাড়ি কিনলো, শানুর বাচ্চার জন্যে একটা খেলনা গাড়ি। শানুর স্বামীর জন্যে একটা দামী সিগারেট লাইটার, ভদ্রলোক সৌখিন মানুষ কিন্তু প্রাণে ধরে বিলাসিতার জিনিস পয়সা খরচ করে কিনতে পারেন না।

রাত আটটায় ট্রেন। রুমী ছ'টার মধ্যে রওনা দিল। সকাল সকাল গেলে ট্রেনে একটু ভালো জায়গা পাওয়া যাবে। সাথে ছোট একটা ব্যাগ, খামোকা রিক্সা করে না গিয়ে সে বাসেই চলে যাবে ভাবছিল, তাতে অনেকগুলো পয়সা বাঁচে। বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করেনি, ওর পাশে একটা গাড়ি এসে দাঁড়ালো। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ইভা বললো, কি খবর রুমী, কোথায় যাচ্ছ?

রুমী একটু অবাক হয়ে এগিয়ে যায়, কমলাপুর স্টেশন।

তাই নাকি? চলো তোমাকে পৌঁছে দিই।

বাসে করে যাবার বদলে গাড়িতে করে যেতে আজ ওর কোনো আপত্তিই ছিল না, কিন্তু ও দেখলো গাড়ির ভিতরে আরও দুজন লোক বসে আছে। একজন সামনে ইভার পাশে, আরেকজন পিছনে। অপরিচিত লোকজনের সাথে প্রায়-অপরিচিত আরেকজন মেয়ের গাড়িতে ওঠা কোনো সুখকর ব্যাপার নয়। কিন্তু ততোক্ষণে পিছনের লোকটা পিছনের দরজা খুলে দিয়ে সরে বসে তাকে জায়গা করে দিয়েছে। রুমী একটু ইতস্ততঃ করে উঠে বসে, ইভা সাথে সাথে গাড়ি ছেড়ে দেয়। হঠাৎ করে কেন জানি রুমীর ইচ্ছে হলো নেমে পড়ে, গাড়ির ভিতরে যেন কি একটা অশুভ জিনিস অপেক্ষা করে আছে। ওর শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা কি যেন একটা নেমে যায়।

কোথাও যাচ্ছ নাকি? ইভা জিজ্ঞেস করে।

হুঁ।

কটায় ট্রেন তোমার? ভারি গলার স্বর শুনে সে পাশে তাকায়, লোকটিকে সে আগে দেখেছে, জোয়ারদার···সেই জ্যোতিষী।

রুমী শুষ্ক গলায় বললো, আটটায়।

ও। বলে জোয়ারদার কোথা থেকে যেন একটা পকেট ঘড়ি বের করলো। লম্বা চেন লাগানো সাথে। সোনালী রঙের চমৎকার একটা ঘড়ি। উপরে কারুকাজ করা ঢাকনা। ঢাকনা খুলে সময় দেখে বললো, এখনো অনেক সময় আছে।

ঢাকনাটা বন্ধ করে চেনটা ধরে রেখে জোয়ারদার আস্তে আস্তে ঘড়িটাকে ঝুলে পড়তে দিল। গাড়ির অল্প কাঁপুনির সাথে ঘড়িটা চেনের মাথা থেকে দুলছে, এতো চমৎকার কাজ, রুমী চোখ ফেরাতে পারে না ঘড়ি থেকে।

ঘড়িটা আস্তে আস্তে দুলছে জোয়ারদারের হাতে, ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে। তাকিয়ে থেকে থেকে রুমীর কেমন যেন মাথা গুলিয়ে আসে, চোখ সরাতে পারে না সে ঘড়ি থেকে। ভয় পেয়ে যায় হঠাৎ। লাফিয়ে উঠে বসতে চায় সে, কিন্তু আবিষ্কার করে ওর কোনো শক্তি নেই, ওর চোখ ভেঙে ঘুম নেমে আসছে।

ঘুমাও তুমি, ঘুমাও—কে যেন ওকে বলছে অনেক দূর থেকে।

না, না, না, রুমী প্রাণপণ চেষ্টা করে জেগে থাকতে, ভয়ের একটা শীতল স্রোত ওর চেতনাকে জাগিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু পারে না।

ঘুমাও, ঘুমাও তুমি, ঘুমাও!

রুমীর চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে আসে। গাড়ির সীটে মাথা রেখে শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়ে এক সময়।

গাড়ি মতিঝিল কলোনির সামনে এসে ঘুরে গেল তারপর ছুটে চললো উল্টোদিকে।

রুমীর ঘুম মাঝে মাঝে হালকা হয়ে এসেছে, কিন্তু একবারও ভাঙেনি। স্বপ্নে দেখছিল উত্তপ্ত মরুভূমির উপর দিয়ে সে প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে আর ওর পিছু পিছু ছুটে আসছে বুনো কুকুরের দল, একটি দুটি নয় হাজার হাজার, অন্ধকারেও তাদের সাদা দাঁত আর হিংস্র চোখ স্পষ্ট দেখা যায়। তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে রুমীর, কিন্তু তবু ও থামতে পারছে না, থামলেই ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বুনো কুকুরের দল, মুহূর্তে ওকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে ধারালো দাঁত দিয়ে। কিন্তু আর পারছে না রুমী, হাঁটু ভেঙে পড়ে গেল বালিতে, কোনমতে উঠে দাঁড়ালো সে, কিন্তু পা যেন গেঁথে গেছে, কিছুতেই নড়তে পারছে না। লক্ষ লক্ষ বুনো কুকুর ছুটে আসছে—আরও কাছে আরও কাছে—তাদের হিংস্র চিৎকারে কানে তালা লেগে যায়, ঝাঁপিয়ে পড়ে তার উপর।

প্রচণ্ড আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে রুমী, সাথে সাথে ঘুম ভেঙে যায় ওর। অনেকক্ষণ লাগলো ওর বুঝতে ব্যাপারটা কি। ধক্ ধক্ করে তখনো ওর বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড শব্দ করছে, প্রচণ্ড তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে, সে শুয়ে আছে একটা অন্ধকার ঘরে আর ঘরের বাইরে সত্যি সত্যি অসংখ্য কুকুর তখনো গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে যাচ্ছে। মনে করার চেষ্টা করলো রুমী কি হয়েছে ওর। আবছা, মনে পড়লো শানুর কাছে যাবার কথা ছিল, কমলাপুর স্টেশনে যাচ্ছিল সে, হঠাৎ—ইভা!

একমুহূর্তে সবকিছু মনে পড়ে যায় রুমীর, সাথে সাথে লাফিয়ে উঠে বসে বিছানায়। কোথায় নিয়ে এসেছে ওকে? অন্ধকার ঘর, ভালো করে কিছু দেখা যায় না। ঘরে আর কেউ আছে কি? কান পেতে শোনার চেষ্টা করলো রুমী, কিছু বুঝতে পারলো না। ছোট ঘর, দরজা জানালা সব বন্ধ, ঘরের একপাশে কি সব জিনিস রাখা। সাবধানে বিছানা থেকে নামে রুমী, হাতড়ে হাতড়ে দেয়াল স্পর্শ করে দরজা খুঁজতে থাকে সে। ঘরটা নোংরা এবং মাঝে মাঝেই ভিজে, ওর পায়ের নিচে কাঠকুটো পাথর চাপা পড়ছে। খুঁজে

খুঁজে দরজা পেল শেষ পর্যন্ত, কিন্তু বাইরে থেকে তালা মারা, ও ফাঁক করে দেখতে পায় দরজার কড়ায় মাঝারি গোছের একটা তালা ঝুলছে।

প্রচণ্ড ভয় পেলো রুমী, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল ওর, মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। তাকে একটা অন্ধকার ঘরে তালা মেরে আটকে রেখেছে। কি করবে তাকে? মেরে ফেলবে? নিশ্চয়ই মেরে ফেলবে! কিন্তু কেন মেরে ফেলবে? ইভার কথা মনে পড়ে ওর, জোয়ারদারের কথা। গাড়িতে নিশ্চয়ই তাকে সম্মোহিত করেছিল জোয়ারদার। কি আশ্চর্য ব্যাপার, সে ঐ ঘড়িটা থেকে চোখ সরাতে পারছে না আর জোয়ারদার তাকে বলে চলছে ঘুমিয়ে পড়তে, কিছুতেই সে জেগে থাকতে পারছে না। কত চেষ্টা করলো জেগে থাকতে অথচ সে ঘুমিয়েই পড়লো শেষ পর্যন্ত। রুমীর সারা শরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে, কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে, ভুরু বেয়ে ঘাম গালের উপর দিয়ে গলার দিকে নেমে যায় স্রোতের মতো।

একটুক্ষণ বসে থাকে সে, তারপর আবার উঠে দাঁড়ায়, হাতড়ে হাতড়ে ঘরটা দেখতে থাকে। কোনো আসবাবপত্র নেই, কোনো জানালা নেই, একটা মাত্র দরজা, তাও বাইরে থেকে তালা মারা। ঘরময় নানা আবর্জনা, ইঁট, গাছের ডাল, মাটি, ভেজা মতন কি সব জিনিস। এক কোণায় ওর পায়ে গোল মতো কি একটা লাগলো। হাত দিয়ে দেখে বেশ মসৃণ, সাবধানে হাতে তুলে নিলো সে। ভিতরটা ফাঁপা, জিনিসটা যতো বড় ওজন তার তুলনায় বেশ কম। সে চোখের কাছে নিয়ে দেখার চেষ্টা করলো, কিছু দেখা যায় না। সাদা মতন একটা কিছু হবে, বোঁটকা গন্ধ রয়েছে মনে হয়। দরজার ফাঁক দিয়ে নক্ষত্রের একটু আলো এসে ঢুকছে, রুমী জিনিসটা সেখানে নিয়ে গেল। সে-আলোতেও ভালো দেখা যায় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে ফেলে দিতে যাচ্ছিল, হঠাৎ জিনিসটা চিনে ফেললো। সারা শরীর শিউরে উঠলো ওর। হাতে একটা মরা মানুষের করোটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। যেটুকু আলো আসছে তাতে স্পষ্ট দেখা যায়, ও চিনতে পারছিল না কারণ ও কল্পনাও করেনি এটা একটা করোটি হতে পারে।

জন্তুর মতো গোঙানোর আওয়াজ করে সে ছুঁড়ে ফেলে দিলো করোটিটা, সশব্দে পড়ে সেটা গড়িয়ে গেল কোণার দিকে। সারা শরীর কাঁপছে রুমীর, ইচ্ছে হচ্ছে চিৎকার করে পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়, দরজা ভেঙে ছুটে পালিয়ে যায় এই অশুভ ঘর থেকে। কিন্তু ওর কিছু করার নেই, টলতে টলতে বিছানার উপর উঠে বসে, করোটির স্পর্শ মুছে ফেলার জন্যে বিকারগ্রস্তের মতো বার বার হাত দুটি বিছানার চাদরে ঘষতে থাকে।

খুব ধীরে ধীরে ভোর হলো। দরজার ফাঁক দিয়ে আলো এসে ঘরের ভিতরকার অন্ধকার তরল করে দিলো, আস্তে আস্তে আর একটি একটি করে ঘরের সবক'টা জিনিস স্পষ্ট হয়ে উঠলো। রুমী অবাক হয়ে গেল এতক্ষণে কেন পাগল হয়ে যায়নি ভেবে। ঘরের মেঝেতে রয়েছে কাপড়ে জড়ানো একটা শিশুর মৃতদেহ, এমন অস্বাভাবিক ভঙ্গিতে পড়ে রয়েছে যে দেখেই বোঝা যায় শিশুটি মৃত। রাতে রুমী কিভাবে শিশুটির মৃতদেহে পা দেয়নি সেটাই আশ্চর্য। ঘরের চারদিকে অসংখ্য বাদুড়, সব কয়টির গলা দুভাগ করে কাটা, কুঁকড়ে কুঁকড়ে পড়ে আছে বাদুড়গুলি। এক কোণে মাটি মাখা মৃত মানুষের হাড়গোড়। দেখে মনে হয় কেউ গোর খুঁড়ে তুলে এনেছে, রাতের সেই করোটিটাও এক কোণায় পড়ে আছে। ঘরের মাঝামাঝি রয়েছে কিছু বড় বড় পাত্র, নানা ধরনের তরল পদার্থ সেখানে,

www.banglabook.com

বোঁটকা গন্ধ বের হচ্ছে সেখান থেকে। এসব বীভৎস জিনিসের মাঝে খুব বেমানান লাগছে একগোছা ফুল—এত সুন্দর জবা ফুল সে জীবনে দেখেনি।

সবকিছু দেখে রুমী খুব আশ্চর্য রকম শান্ত হয়ে যায়। কাপড়ে জড়ানো শিশুর মৃতদেহটিও তাকে আর বিচলিত করছে না, মৃত মানুষের হাড়গোড় তার মনে হতে থাকে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। ঘর ভরা এসব বীভৎস জিনিসের ভিতর বসে থেকে তার খিদে পেতে থাকে। সে হাঁটুতে মুখ রেখে অপেক্ষা করতে থাকে কি হয় দেখার জন্যে।

অনেক বেলা করে একজন লোক তালা খুলে ঘরে এসে ঢোকে। মুখে দাড়ি গোঁফের জঙ্গল, হাসিখুশি চেহারা। চোখ দুটির দিকে না তাকালে মনে হয় বুঝি খুব আমুদে মানুষ, চোখ দুটি স্থির, মনে হয় মৃত মানুষের। লোকটা গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বাসনপত্র টানাটানি করতে থাকে। ঘরে যে রুমী বসে আছে সেটা যেন ওর চোখেও পড়ছে না। রুমী আস্তে আস্তে বললো, আমি একটু পানি খাবো।

লোকটা কথা শুনেছে কিনা বোঝা গেল না, একমনে নিজের কাজ করতে থাকে। কয়টা বাসন নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে যাবার সময় রুমী আরেকবার একটু জোরে বললো, আমি একটু পানি খাবো।

লোকটা না শোনার ভান করে ঘরে তালা মেরে চলে গেল। একটু পরে কিন্তু সত্যি এক গ্লাস পানি নিয়ে ফিরে আসে। গ্লাসটা পরিষ্কার, রুমী এক নিঃশ্বাসে ঢক্ ঢক্ করে পুরো পানিটুকু খেয়ে নিল। গ্লাসটা ফিরিয়ে দিয়ে বললো, আমি এখান থেকে যাবো।

লোকটার মুখ দেখে মনে হলো সে যেন ভারি মজার একটা কথা শুনেছে। খিক খিক করে হাসতে হাসতে বললো, তাই নাকি? চেষ্টা করে দেখ না, ভুঁড়ি কিভাবে ফাঁসিয়ে দিই দেখবে না? লোকটা রুমীর দিকে তাকিয়ে হাসতে থাকে। কি নিষ্করুণ দৃষ্টি! রুমীর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে আর কোনো কথা না বলে বিছানায় বসে থাকে, প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল এখন সেটাও কেমন ভোঁতা হয়ে বমি বমি লাগছে।

ঘর থেকে সবকিছু বাইরে নিয়ে সামনের ফাঁকা মতো জায়গাটাতে বেশ কয়েকজন লোক মিলে কি কি করতে শুরু করে। দুএকজন বিভিন্ন বয়সী মেয়েও আছে। একে একে সবাই এসে রুমীকে উঁকি মেরে দেখে গেছে, কেউ কিন্তু একটা কথাও বলেনি। রুমীর নিজেকে মনে হতে লাগলো খাঁচায় আটকে রাখা একটা অদ্ভুত জন্তু। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করে বাইরে কি হচ্ছে। একটা বড় আগুন জ্বালানো হয়েছে, চারপাশে ইঁট সাজিয়ে একটা চুলার মতন তৈরি করে সেখানে একটা বড় ডেকচি বসানো হয়েছে। একজন খালি গায়ে ঘর্মাক্ত শরীরে মস্ত বড় একটা হাতা দিয়ে প্রাণপণে ডেকচির ভিতরের ফুটন্ত তরল জিনিসটা নেড়ে যাচ্ছে। এদিকে সেদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে লোকজন নানা কাজে ব্যস্ত। কথাবার্তা শুনে মনে হয় একটা বড় উৎসবের প্রস্তুতি চলছে। রুমীর দিকে পিছন দিয়ে কটা লোক কি যেন কাটাকাটি করছে, একজন একটু সরতেই রুমী দেখতে পেল শিশুর মৃত দেহটি। গা গুলিয়ে বমি এসে গেল ওর, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে কোনমতে সরে আসে সে। কি ভয়ানক ব্যাপার! এ কাদের পাল্লায় পড়েছে সে? রুমী চোখ বুজে বসে থাকে, কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই—কথাবার্তা ভেসে আসে তখন। সব সে বুঝতে পারে না. কিন্তু একটি দুটি যা শুনতে পায় তাতে তার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে।

উল্টাপাল্টা কোপ দিয়ে নষ্ট করিস না।

সবার কি আর তোর মতো মরা কাটার ডিগ্রী আছে।

ডিগ্রী লাগে না, একটু কাণ্ডজ্ঞান থাকলেই হয়। কোথায় রাখবো?

এইখানে এইখানে। এইটুকু মাত্র চর্বি?

দুই বছরের একটা বাচ্চার কতটুকু চর্বি থাকবে? আধমণ?

ভালো বলেছিস···হি হি হি···

দেখো তো রঙটা কেউ, পানসে লাগছে না?

ঠিক হয়ে যাবে, বাদুড়ের রক্তটুকু দিলেই ঠিক রং চলে আসবে।

মনে আছে গতবার, কিছুতেই বাদুড় পাওয়া গেল না, শেষে কয়টা চামচিকে ধরে এনে--হি হি হি···

চামচিকে আর বাদুড়ের মাঝে তফাৎ কি? একটা ছোট আরেকটা বড় এ ছাড়া আর কি তফাৎ?

আরে দূর—দুটো একেবারে ভিন্ন জিনিস!

সে কি রক্ত জমে গেছে যে?

ও কিছু হবে না। ঢেলে দাও।

বোতলটা কার কাছে?

কখন শেষ হয়ে গেছে! তুমি আছো কোন্ দুনিয়ায়?

আরেকটা বের করো না কেউ!

বেশি খেয়ো না, তোমার তো লেমনেড খেলেই নেশা হয়ে যায়।

হি হি হি···

একটু পরে বাইরে কথাবার্তা কমে আসে। একজন শুধু বসে বসে বড় ডেকচিতে একটা হাতা দিয়ে নাড়ছে। ঝাঁঝালো কটু গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে। রুমীর কেমন অস্বস্তি হতে থাকে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে তার, কিন্তু কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। এমন সময় হঠাৎ সে ইভার গলার স্বর শুনতে পায়। এই সর্বনাশী মেয়েটার উপরে তার যতো আক্রোশই থাকুক না কেন এখন সেই হচ্ছে একমাত্র পরিচিত। রুমী দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকলো, ইভা এই ইভা!

ইভা একজনের সাথে কথা বলছিল, ঘুরে ওর দিকে তাকালো, কিন্তু তাকে চিনতে পেরেছে সেরকম ভাব দেখালো না। রুমী রাগে প্রায় অন্ধ হয়ে আবার ডাকে, এবারে কাছে এগিয়ে আসে ইভা, কি হয়েছে?

রাগ দুঃখ হতাশা সব মিলিয়ে অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো রুমীর। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে ওর, কোনমতে বললো, আমাকে জিজ্ঞেস করছো কি হয়েছে?

ইভা নিস্পৃহ ভাবে হাত উল্টিয়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করে, রুমী ওকে থামানোর চেষ্টা করে, আমাকে এখানে এনেছো কেন?

কাজ আছে।

কি কাজ?

সময় হলেই দেখবে।

আমাকে কেন?

তোমার মতোই একজন দরকার, ভালো মিডিয়াম।

মানে?

ইভা কাঁধ ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়, তুমি বুঝবে না।

রুমী আর কি বলবে বুঝতে না পেরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ইভা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আবার চলে যাচ্ছিলো, রুমী আবার তাকে থামায়, আমার খুব খিদে পেয়েছে কিছু খেতে দেবে?

সে কি! তোমাকে কেউ খেতে দেয়নি? ইভা হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দেয়। এইটুকু সমবেদনাতেই হঠাৎ করে কেন জানি রুমীর চোখে পানি এসে পড়ে।

ইভা কিছুক্ষণের মাঝেই এক প্লেট বোঝাই খাবার এনে দরজার ফাঁক দিয়ে সাবধানে ঘরের ভিতর গলিয়ে দেয়। রুটি, মাখন, ডিম, মাংসের তরকারি, সবজি এমন কি একটা পেট মোটা বোতলে আধ বোতল মদ। রুমী বুভুক্ষের মতো খাওয়া শুরু করে। ভীষণ খিদে পেয়েছিল ওর, কিন্তু বেশি খেতে পারলো না। হঠাৎ করে ওর পেট ভরে বমি বমি লাগতে থাকে। পান খেতে পারলে হতো একটা, মিষ্টি সুপারি দিয়ে সুগন্ধি একটা পান!

রুমী বাড়তি খাবারটুকু বিছানার নিচে রেখে দিল। আবার কখন ওরা খেতে দেবে কে জানে। মদের বোতলটা ফিরিয়ে দিতে দরজার কাছে এসে দেখে ইভা অন্যমনস্ক ভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে, মুখের ভাব দেখে মনে হয় যেন একটু বিচলিত। যত আক্রোশই থাকুক, এই সর্বনাশী মেয়েটার অস্বাভাবিক সৌন্দর্যকে অস্বীকার করা যায় না। রুমী ওকে ডেকে বোতলটা ফিরিয়ে দেয়।

খাও না বুঝি তুমি?

রুমী মাথা নাড়লো। ইভা ছিপি খুলে বোতলে মুখ লাগিয়ে এক ঢোক খেয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে নেয়। রুমী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, সে আগে কখনো কাউকে মদ খেতে দেখেনি।

তোমরা কারা?

রুমীর প্রশ্ন শুনে ইভা কেমন যেন একটু চমকে ওঠে। উত্তর দেবে, রুমী আশা করেনি। কিন্তু ইভা বোতলটা হাতে নিয়ে বারান্দায় পা ঝুলিয়ে বসে ওর প্রশ্নের উত্তর দেয়, আমরা ডেভিল বা শয়তানের উপাসক। ইংরেজীতে আমাদের বলে উইচ! বাংলায় ডাইনী। কিন্তু ডাইনী কথাটা আমার একেবারে পছন্দ হয় না, আমাকে কি ডাইনীর মতো দেখায়?

রুমীকে স্বীকার করতেই হয় ইভাকে ডাইনীর মতো দেখায় না।

কখনো ব্ল্যাক আর্টের নাম শুনেছ?

রুমী মাথা নাড়ে, না।

ব্ল্যাক আর্ট হচ্ছে...

ইভার কাছে পরের এক ঘন্টা রুমী আশ্চর্য এক জগতের খবর শুনলো।

মানুষ একই সাথে ঈশ্বর এবং শয়তানের অস্তিত্বের সাথে পরিচিত হয়েছিল। বেশিরভাগ মানুষ ঈশ্বরের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু এর উল্টোটাও হতে পারতো, সৌভাগ্যবশতঃ হয়নি, হয়তো সেটাই ঈশ্বরের ইচ্ছা। কিন্তু ঈশ্বরের প্রভুত্বকে অস্বীকার করে শয়তানের প্রভুত্ব মেনে নিয়েছে সেরকম মানুষ একেবারে নেই তা সত্যি নয়। ষোড়শ

শতাব্দীর দিকে সারা ইউরোপ এ ধরনের মানুষে ছেয়ে গিয়েছিল। তাদের এই শয়তান বা ডেভিলের কাছে বশ্যতা স্বীকার করার এবং তার উপাসনা করার বিভিন্ন পদ্ধতিকে বলে ব্ল্যাক আর্ট বা ব্ল্যাক ম্যাজিক। সাধারণ সমাজ কখনো এদের ভালো চোখে দেখেনি, দেখার কথাও নয়। যুগ যুগ ধরে মানুষ যে-সব নীতি এবং বিশ্বাস নিয়ে গড়ে উঠেছে সে-সব কিছুকে অস্বীকার করে এরা অদ্ভুত একটা বিকৃত ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকে। শুধু ধর্ম নয়, সত্য-ন্যায় এবং যে-কোনো ভালো জিনিসের সাথে এদের যুদ্ধ। শয়তানের প্রভুত্ব স্বীকার করে নেয়ার পর শয়তান এদের অনেক আশ্চর্য ক্ষমতা দিতে পারে বলে এরা বিশ্বাস করে। এর জন্যে এরা এমন কোনো বিকৃত কাজ নেই যা করতে পারে না। এদের নানা ধরনের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে, বিশেষ করে ধর্মের বিরুদ্ধে লেগে থাকার জন্যে ধর্মযাজকরা খুব খেপে উঠে এদের ধরে পুড়িয়ে মারা শুরু করে। সেই সময়ে সারা ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডের হাজার হাজার শয়তান উপাসক নরনারীকে প্রকাশ্যে পুড়িয়ে মারা হয়। অনেক নির্দোষ মানুষ যে মারা যায়নি তা নয়, কিন্তু এদের সংখ্যা সত্যিই কমে গিয়েছিল।

বহুকাল পরে বিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন অনেক কিছু সহ্য করতে শিখেছে এরা আবার তখন আস্তে আস্তে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। খানিকটা নিষিদ্ধ কৌতূহল, খানিকটা বিশ্বাস, খানিকটা লোভ নিয়ে অনেকে আবার সেই পুরাতন শয়তান উপাসনায় ফিরে গিয়েছে। পাশ্চাত্য দেশে জাতি-দ্বেষ, নাৎসীবাদ, সমকাম কোনো কিছুই আর বেআইনী নয়, তাই শয়তান উপাসনাতে আপত্তি কিসের? আগের মতো এটা আর ছড়িয়ে পড়বে না কারণ পাশ্চাত্যের লোকজন এখন পুরোপুরি পার্থিব জগতের বাসিন্দা। উপাসনাতে—তা ঈশ্বরেরই হোক আর শয়তানেরই হোক তারা আর উৎসাহী নয়। শুধু উপাসনা নয়, তারা কোনো ব্যাপারেই পার্থিব জগতের বাইরে যেতে চায় না। এদেশের খেটে খাওয়া একজন চাষীর যে পরিমাণ আধ্যাত্মিক জগৎ রয়েছে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে শিক্ষিত লোকটিও তা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারে না।

ইভা এবং তাদের দলের কিছু লোকজন আমেরিকা এবং ইউরোপ থেকে শয়তানের উপাসনা শিখে এসেছে। পাশ্চাত্যের শয়তান বা ডেভিলের উপাসক আর এদেশের প্রেত সাধক কাপালিকেরা মিলে এরা নতুন ধরনের ব্ল্যাক আর্ট শুরু করার চেষ্টা করছে। বছর দুয়েক হলো ওরা এখানে সেখানে শয়তান উপাসনার অনুষ্ঠান শুরু করেছে। চেষ্টা করলে শয়তান বা ডেভিলকেও অনুষ্ঠানে হাজির করা যায়, কিন্তু তার জন্যে বিশেষ গুণসম্পন্ন একটা মানুষ দরকার, সেই ধরনের মানুষকে ওরা মিডিয়াম বলে। গত ছয়মাস থেকে জোয়ারদার হাত দেখার ভান করে মিডিয়াম খুঁজে যাচ্ছিল। একটা মোটামুটি ভালো মিডিয়াম পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু রুমী তার থেকে অনেক ভালো, ওর হাতে নাকি তার স্পষ্ট চিহ্ন আছে। সেজন্যেই রুমীকে এভাবে ধরে এনেছে, এমনিতে সে কখনোই রাজি হতো না।

ইভা রুমীকে বারবার বোঝালো, এতে কোনো ভয় নেই, রুমী কিছু জানতেও পারবে না, প্ল্যানচেট করে আত্মা আনার মতো ব্যাপার। রুমীর বিশ্বাস হয়নি, সব শুনে ওর আত্মা শুকিয়ে গেছে।